প্রাসাদপুত্র

প্রাসাদপুত্র

মাহিন মাহমুদ

মাকতাবাতুল হাসান

প্রাসাদপুত্র
প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০২০খ্রি.
গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত
প্রকাশনায়
মাকতাবাতুল হাসান
গিয়াস গার্ডেন বুক কমপ্লেক্স
৩৭ নর্থ ব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা
✆ ০১৭৮৭০০৭০৩০
মুদ্রণ : শাহরিয়ার প্রিন্টার্স, ৪/১ পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা
অনলাইন পরিবেশক : rokomari.com - wafilife.com - niyamahshop.com
ISBN : 978-984-8012-61-1
Web : www.maktabatulhasan.com

মুদ্রিত মূল্য : ৩৮০ টাকা মাত্র

Prasad Putro
By Mahin Mahmud
Published by : Maktabatul Hasan, Bangladesh
E-mail : info.maktabatulhasan@gmail.com fb/maktabatulhasan

অর্পণ...

‘নিষ্ঠুর মানুষ!’

‘কেন, কী করেছি?’

‘এত এত মানুষকে অর্পণ করা হয়, আমাকেই শুধু চোখে পড়ে না।’

মেহেরিন মাহমুদ পপি—জীবনসঙ্গিনীকে।

©
প্রকাশক
প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ে প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্যসংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

গতরাতে একটা ভয়ংকর ঘটনা ঘটে গেছে। রাত তখন দশটা। আমি আমার মেসের বিছানায় শুয়ে আছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমের রাজ্যে চলে যাওয়ার ইচ্ছে। ঘুমোনোর আগে দোয়া-দরুদ পড়ছি আর পূর্বজীবনের কৃতকর্মের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করে নিচ্ছি।

আমার এই জীবনের আগে একটা জীবন ছিল। যার নাম- ইচ্ছেজীবন। মনচাহি জিন্দেগি। ব্রেকহীন যানবাহনের মতো। কয়েক বছর হলো সেই ইচ্ছেজীবন থেকে অব্যাহতি নিয়েছি।

আমি মানুষটা প্রচণ্ড জোছনাপ্রেমী। গতরাতটি ছিল চতুর্দশী পূর্ণিমা-রাত। আকাশে রুপোলি থালার মতো ঝলমলে চাঁদ। চাঁদের সেই মায়াবি জোছনা গায়ে মাখার জন্য দরজাটা খোলা রেখেছিলাম। ঘরে জানালা আছে। তবুও দরজা খোলা রাখতে হলো কেন? কারণ তো আছেই। জানালাটা খুলতেই যে ছাদটি চোখে পড়ে সেটি একটি গার্লস হোস্টেলের ছাদ।

সময় পেলেই হোস্টেলের মহীয়সীরা ছাদে আসেন। তাদের ভার্সিটি কিংবা কর্মস্থলের সারাদিনের ঘটে যাওয়া ঘটনাসমূহ নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে গিয়ে হাসিতে ফেটে পড়েন। কৌতূহলবশত জানালা দিয়ে মাঝে মাঝে আমার ঘরের দিকে উঁকিঝুঁকিও মারেন। ঘরের দৈন্যদশা দেখে তাদের করুণা হয় কি না কে জানে, প্রায়ই ফিসফিসিয়ে সেই ঘটনা নিজেরা নিজেরা আলোচনাও করেন।

আলোচনা কানে আসতে থাকলে চোখও সেদিকে চলে যায়। চোখ হচ্ছে শয়তানের তির। আমি সেই বিষমাখা তির থেকে বাঁচার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। ছাদের সেইসব মহীয়সীদের থেকে নিজেকে বাঁচাতেই জানালাটা পাকাপাকি আটকে দিয়েছি। একেবারে

হাতুরি-গজাল ব্যবস্থা। সুতরাং মহান আল্লাহ তাআলার অপরূপ সৃষ্টি—চাঁদ দেখার জন্য দরজা খোলা রাখা ছাড়া আমার আর কোনো উপায় ছিল না।

চাঁদ দেখতে দেখতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম মনে নেই। হঠাৎ দরজায় খুট করে একটা শব্দ হলো। মনে হলো কেউ আমার ঘরে ঢুকেছে। আগন্তুকের পায়ের খসখস শব্দ শুনতে পাচ্ছি। আমার মুখ ও মাথা দেয়ালের দিকে। চোখ বন্ধ করেই অনুভব করার চেষ্টা করছি, ঘরের ভেতর কী ঘটছে। প্রথমে একজন মনে হলেও পরমুহূর্তে মনে হলো একজন না; সংখ্যায় ওরা কয়েকজন।

আমি দেয়ালের দিক থেকে মাথা ঘুরিয়ে ঘটনার উৎস খুঁজতে যাব, তার আগেই প্রচণ্ড শক্তিতে কেউ একজন আমার কাঁধে ভারি কিছু দিয়ে আঘাত করল। আমি ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাতেই বিস্মিত হলাম। মুখোশ পরা চারজন মানুষ আমার বিছানার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তিনজনের হাতে মোটা রড। একজনের হাতে অন্যকিছু। আমি ভয়ার্ত গলায় বললাম, 'কারা আপনারা?'

'আমরা তোর যম! এখন আমরা তোর হাত-পা ভেঙে লুলা করে দেবো।'

হাত-পা ভাঙার কথা হচ্ছে, এর মধ্যেই একজন দুম করে আমার পেটে ছুরি চালিয়ে দিলো। আমি প্রচণ্ড ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠলাম। আগন্তুকদের একজন লোকটাকে বলল, 'অই ব্যাটা, এইটা তুই কী করলি! ওর বাবা তো বলছিল হাত-পা ভাঙতে; ছুরি মারলি কেন?...এখন যদি মরে-টরে যায়? চল পালাই!'

লোকগুলো চলে যেতেই আমি বহু কষ্টে উঠে বসলাম। পেট থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে। আমি পেট চেপে ধরে আছি। রক্তে ভেসে যাচ্ছে বিছানা। রাতে পাঞ্জাবি পরেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সাদা সেই পাঞ্জাবিটা আর সাদা নেই। রক্তে লাল হয়ে গেছে। মাথাটা ভনভন করে ঘুরছে। আমি প্রাণপণ চিৎকার করছি—'কেউ আছেন? কেউ আছেন এখানে? প্লিজ আমাকে বাঁচান!'

কোনো সাড়াশব্দ পাচ্ছি না। গভীর রাত। এত রাতে কেউ জেগে থাকার কথা না। রক্ত কিছুতেই বন্ধ হচ্ছে না। শরীর ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে আসছে। বমি বমি লাগছে। দ্রুত কোনো হসপিটালে যাওয়া দরকার। কেউ তো জেগে নেই। কে নিয়ে যাবে আমাকে হসপিটালে?

অন্তত সামনের রাস্তা পর্যন্ত যেতে পারলেও হতো। কিছু না কিছু একটা ব্যবস্থা হয়ে যেত। কিন্তু আমার এখন যে অবস্থা। দোতলা থেকে নেমে রাস্তা পর্যন্ত যেতে পারব বলে মনে হয় না। এর আগেই মাথা ঘুরে পড়ে যাব।

বিপদে কেউ সাড়া না দিলেও একজন ঠিকই সাড়া দেন। আল্লাহ। আমি শরীরের সর্বশক্তি দিয়ে চিৎকার করে ডাকলাম—'আল্লাহ! তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই। আমাকে সাহায্য করো!...'

আর তখনই আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমি ধড়মড় করে শোয়া থেকে উঠে বসলাম। ক্রমাগত হাঁপাচ্ছি। পুরো পৃথিবীটা যেন চোখের সামনে দুলছে। আকাশে তখনও ঝকঝকে চাঁদ। চাঁদের আলো আমার বিছানায় চুঁইয়ে পড়ছে। গায়ের সাদা পাঞ্জাবি ঘামে ভিজে আছে। পেটে হাত দিলাম। ভেজা ভেজা লাগছে। রক্তের ভেজা না, ঘামভেজা হয়ে আছে। টেবিলে জগভরতি পানি। ভয়ংকর স্বপ্নের ধকলে শরীর এতটাই ক্লান্ত, উঠে গিয়ে পানি খাওয়ার শক্তিটাও পাচ্ছিলাম না। তবুও উঠতে হলো। পরপর দুই গ্লাস পানি পান করে আবার বিছানায় ফিরে এলাম।

ভয়ানক এই দুঃস্বপ্ন আমি গত কয়েকদিন ধরেই দেখছি। পাত্তা দিচ্ছি না। সকাল হলেই সব ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করছি। গভীর রাতে দেখা স্বপ্ন নাকি সত্যি হয়। আমার এই স্বপ্ন সত্যি হবে বলে মনে হচ্ছে না। দ্বীনের পথে চলছি বলে আমার বিত্তবান বাবা যতই আমকে অপছন্দ করেন, গুন্ডা পাঠিয়ে মেরে ফেলার মতো নিষ্ঠুর কাজটি নিশ্চয়ই তিনি করবেন না!

খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে আসে। এইসব স্বপ্ন দেখার পর বাম দিকে থুথু ফেলে 'আউজুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম' বলতে

হয়। এতে সেই স্বপ্নের মন্দ প্রভাব থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। আমি তিনবার থুথু ফেলে আউজুবিল্লাহ পড়ে নিলাম। এরপর বাথরুমে ঢুকে অজু করে নিলাম। জায়নামাজটা বালিশের কাছেই ছিল। সেটা বিছিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম রবের দরবারে। নামাজে হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের কথা মনে এলো। তিনি তাঁর পিতার জন্য দোয়া করেছিলেন—

> "রাব্বিগফিরলি ওয়ালি ওয়ালিদাইয়া ওয়ালিল মু'মিনিনা ইয়াওমা ইয়াকুমুল হিসাব।"
>
> হে আমার প্রতিপালক! হিসাবের দিন আমাকে এবং আমার পিতামাতা ও সকল ইমানদারকে ক্ষমা করুন!

আমার ছোটমামা লন্ডনে থাকেন। আমার প্রতি তার ছিল অসীম ভালোবাসা। সম্পর্ক ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ। একটা না একটা উসিলায় প্রতি মাসেই তিনি আমার জন্য গিফট পাঠাতেন। যেই সেই গিফট না। দামি দামি গিফট! একবার বন্ধুদিবসে মামা ফোন করে বললেন, 'আচ্ছা ভাগনে, জগতে এত-এত দিবস আছে মামা-ভাগনে দিবস নাই কেন?'

'কী জানি মামা! কেন নাই, বুঝতে পারছি না।'

'থাকা দরকার ছিল। মামা-ভাগনের চেয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আর আছে নাকি!'

'হুম, ঠিকই।'

'হুম-হুম করছিস কেন?'

‘তাহলে কী করব?’

‘তোরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেপেলে। টিএসসি কিংবা শাহবাগের মোড়ে দাঁড়িয়ে আন্দোলন-ফান্দোলন কর! স্যোশাল মিডিয়ায় মামাদিবসের উপকারিতা জানিয়ে লেখালেখি কর! তোরা তো চাইলে সবই পারিস!’

আমি আর কোনো মোড়ে দাঁড়িয়েই আন্দোলনে যাওয়ার সুযোগ পেলাম না। তার আগেই জীবনের মোড় পাল্টে গেল।

আমি দ্বীনে আসার পর আমার এই মামা বেজায় অখুশি হলেন। ফোন করে বললেন, ‘শেষপর্যন্ত মৌলভি হয়ে গেলি! তোর কাছ থেকে এইটা আমি কখনোই আশা করি নাই। ভেবেছিলাম এই মাসে তোকে একটা মহামূল্যবান সোনার হার উপহার পাঠাব। সেই ভাবনা উইথড্র করে নিলাম। গতমাসে তোকে যে ঘড়িটা পাঠিয়েছিলাম, সেটা আজই তোর মামির কাছে ফেরত দিয়ে আসবি।’

সামান্য একটা ঘড়ি। যদিও খুব দামি। কিন্তু, মামার কাছে এর মূল্য কিছুই না। তার একদিনের উপার্জনের একাংশও না। তার ওপর, কোনোকিছু উপহার দিয়ে সেই উপহার ফেরত নেওয়ার মতো মানুষ, মামা না। তবুও সেই ঘড়ি তিনি ফেরত চাইলেন। কারণ একটাই। আমার হুজুরজীবন তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না। শক খেয়ে গেছেন। শক খেয়ে যা মুখে আসছে তাই বলছেন। আমি হেসে বললাম, ‘মামা, আমাকে সোনার হার না পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে ভালো করেছ। ছেলেদের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার করা হারাম। আমারগুলোই আমি বিক্রি করে দিয়েছি।’

‘আর, ঘড়ি?’

‘ওটাও মামির কাছে ফেরত দিয়ে আসব।’

‘গুড।... ইহজীবনে তুই আর আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবি না।’

‘কেন, মামা?’

‘কেন করবি না বুঝতে পারছিস না?’

‘না মামা, বুঝতে পারছি না। বুঝিয়ে না বললে বুঝব কী করে?’

‘তুই যে একটা নির্বোধজীবন বেছে নিয়েছিস, সেটাও বুঝতে পারছিস না? না বুঝলে মুন্সিগিরি করগে যা।’

এইটুকু বলেই মামা ফোন রেখে দিতে চাচ্ছিলেন। আমি তড়িঘড়ি করে বললাম, ‘মামা, আমার একটা কথা শোনো। এরপর ফোন রেখে দিয়ো।’

‘কী কথা?’

‘বিদেশে তুমি যে অফিসে কাজ করো, সেখানকার অফিসটাইম কয়টা থেকে কয়টা?’

‘ন-টা থেকে পাঁচটা! এই প্রশ্ন কেন?’

‘এই টাইমিং কে চালু করেছে?’

‘কে আবার, অফিস অথরিটি!’

‘তুমি এখন লাখ লাখ টাকা উপার্জন করো। অথরিটি মেনে চলার দরকারটা কী? নিজের ইচ্ছেমতো চললেই তো পারো? মনে করো নয়টার জায়গায় বারোটায় অফিসে গেলে!’

‘তুই কি আমাকে জ্ঞান দেওয়ার চেষ্টা করছিস? কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই আমার? অথরিটি মেনে না চললে কি আমার চাকরি থাকবে?’

‘আমিও তো তাই বলি মামা! অথরিটি মেনে চলাটা যদি বুদ্ধিমানের কাজ হয়, আমাকে কেন নির্বোধ বলা হচ্ছে? আমিও তো সবচেয়ে বড় অথরিটি, মানে, আমাকে যিনি বানিয়েছেন, সেই সর্বশক্তিমানের কথা মেনেই চলার চেষ্টা করছি! তবুও কেন আমি তোমাদের চোখে নির্বোধ আর কাণ্ডজ্ঞানহীন হব?’

মামা আমার এই কথার কোনো জবাব দিলেন না। রাগ করে ফোন রেখে দিলেন। এরপর থেকে তিনি সত্যি সত্যি আর কোনো যোগাযোগ রাখলেন না।

শুধু এই মামাই না, হুজুরজীবন বেছে নেওয়ার পর বড়লোক আত্মীয়স্বজনদের অনেকের কাছেই আমি ‘কাণ্ডজ্ঞানহীন’ হয়ে বসে আছি। এর একজন হলেন মুশু ভাই।

মুশু ভাই আমাদের খুব কাছের একজন আত্মীয়। কাজিন রোবেনা আপুর হাজব্যান্ড। অভিনয়জগতে তাকে সবাই অন্য নামে চিনলেও আমরা ডাকি মুশু ভাই বলে। বর-বধূ দুজনই অভিনয় করেন। আপা বেশি সুনাম করতে না পারলেও দুলাভাই 'মার্কেট' পেয়ে গেছেন। তিনি খুব অল্পদিনেই জনপ্রিয় হয়ে গেছেন। সেই জনপ্রিয়তার সুবাদেই কিনা, আজকাল মুশু ভাই নারীজাতির পর্দার বিধান নিয়েও উল্টাপাল্টা মন্তব্য করা শুরু করেছেন।

সেদিন ইউনিভার্সিটি থেকে বের হয়ে মেসের দিকে যাচ্ছি। কোথা থেকে যেন মুশু ভাই এসে উদয় হলেন। গাড়ির জানালা দিয়ে থ্যাবড়া চেহারাখানা বাড়িয়ে দিয়ে, দন্তরাশি বিকশিত করে বললেন, 'আরে, আদি হজরত নাকি! যাচ্ছ কোথায়? মসজিদে নিশ্চয়ই? এ ছাড়া আর যাবেই-বা কোথায়? মোল্লার দৌড় তো মসজিদ পর্যন্তই।'

আমি শীতলচোখে মুশু ভাইয়ের দিকে তাকালাম। বোঝাই যাচ্ছে, রাস্তায় একা পেয়ে আমাকে খোঁচা মারা হচ্ছে। এইসব খোঁচাটোচা বহু আগেই হজম করা শিখে ফেলেছি। আমি তার খোঁচাখুঁচি গায়ে মাখলাম না। হাসিমুখে শান্ত গলায় বললাম, 'মুশু ভাই ভালো আছেন?'

'হুম।'

'এই ভরদুপুরে কোথায় যাচ্ছেন?'

'এফডিসিতে। শুটিং আছে।'

'ও আচ্ছা। কীসের শুটিং?'

'নাটকের।'

'চলুন, আমিও আপনার সঙ্গে যাব।'

'আমার সঙ্গে যাবে, মানে? কোথায় যাবে?'

‘শুটিং দেখতে। আপনার নাটকের শুটিং দেখার আমার খুব ইচ্ছে।’

মুশু ভাই মোটামুটি বিভ্রান্তিতে পড়ে গেছেন। মনে মনে বলছেন, ‘টুপিওয়ালা ছেলে বলেটা কী! সে নাকি নাটকের শুটিং দেখবে!’

আমি তার ভ্যাবাচ্যাকা চেহারার সামনে হাত নেড়ে বললাম, ‘এইভাবে তাকিয়ে আছেন কেন ভাই? তাড়াতাড়ি করুন। আপনার শুটিংয়ের সময় নষ্ট হচ্ছে।’

মুশু ভাই গাড়ির দরজা খুলে দিতেই আমি চট করে ভেতরে ঢুকে পড়লাম। ঢুকেই চোখ কপালে উঠে গেল। কী আজিব কারবার! গাড়ির বাইরে থেকে এতক্ষণ লক্ষ করিনি, মুশু ভাই হনুমানের পোশাক পরে বসে আছেন!

নাটকের প্রয়োজনেই হয়তো পরেছেন। কস্টিউম চমৎকার হয়েছে! মুশু ভাইকে একেবারে আসল হনুমানের মতো লাগছে। দেখে বুক ফেটে হাসি পাচ্ছে।

গাড়ি চলছে। হনুমান-বিষয়ে কিছু বলতে যাব, তার আগেই মুশু ভাই বললেন, ‘তোমরা মোল্লারা আমাকে নিয়ে যা শুরু করেছ! দেশ ছেড়ে চলেই যেতে হবে বলে মনে হচ্ছে।’

‘আপনাকে নিয়ে আবার কী শুরু হয়েছে মুশু ভাই? জানি না তো!’

‘জানো ঠিকই। প্রকাশ করতে চাচ্ছ না। সেদিনের টিভি-টকশোটা দেখোনি? আমি কি ভুল কিছু বলেছি? নারীদের ধর্ষিতা হওয়ার পেছনে তোমরা তাদের পোশাককে দায়ী করছ। এটা একটা স্বাধীন দেশ। এই দেশে কে কোন পোশাক পরবে না পরবে, এটা কি তোমরা ঠিক করে দেবে? ইচ্ছেমতো পোশাক পরা তো প্রতিটি নারীর নিজস্ব স্বাধীনতা!’

আমি বললাম, ‘বাদ দেন তো মুশু ভাই। এইসব নিয়ে কথা বলতে ভালো লাগছে না।’

‘আচ্ছা, বাদ দিলাম। তোমার খবর বলো। কী করছ আজকাল?’

‘কী আর করব! ক্যাম্পাস টু মেস, মেস টু ক্যাম্পাস—এই করেই চলছে!’

‘কী জীবন যে বেছে নিয়েছ! আরাম-আয়েশ, ভোগবিলাস ছেড়ে কেউ এইরকম পাগলামি করে!’

আমি বললাম, ‘আমি কি একাই পাগলামি করছি, মুশু ভাই? জগতে সবাইই কিছু না কিছু পাগলামি করছে। এই যেমন আপনি।’

‘আমি! আমি আবার কী পাগলামি করলাম?’

‘হনুমানের কস্টিউম পরে বসে আছেন কেন মুশু ভাই? দেখে খুবই হাসি পাচ্ছে। হনুমানের সাজে সাজতে আপনাকে কে বলেছে, রোবেনা আপু বলেছে?’

‘আরে নাহ। পরিচালকের নির্দেশ। নাটকে হনুমানের একটা পার্ট আছে! রাতের বেলা নায়িকাকে হনুমান সেজে ভয় দেখাতে হবে।’

‘বুঝলাম। তাই বলে হনুমান সাজতে গেলেন কেন, অন্য কিছু সাজতেন! আপনি একজন জনপ্রিয় অভিনেতা। আপনাকে কেন পরিচালকের কথামতো সাজতে হলো?’

‘কী যে বলো না আদি! যতই জনপ্রিয় হই, নিজের ইচ্ছেমতো চললে কি আর চাকরি থাকবে?’

‘কেন থাকবে না? স্বাধীন দেশ। এই দেশে একজন জনপ্রিয় অভিনেতার পোশাক পরার স্বাধীনতা কেন থাকবে না? এ অন্যায়। এ অবিচার। এটা মেনে নেওয়া যায় না।’

মুশু ভাই আমার কথা শুনে হাসতে লাগলেন। অভিনয়ে তার চরিত্রগুলোও ভীষণ হাসির। গোপালভাঁড়ের মতো, লোক হাসানোই তার কাজ। হেসে বললেন, ‘এটাই নিয়ম। পরিচালক যেভাবে বলেন সেভাবেই কস্টিউম সিলেকশন করতে হয় রে পাগল! এর অন্যথা হলে লাথি দিয়ে ইন্ডাস্ট্রি থেকে বের করে দেবে না!’

আমি হঠাৎ ঈষৎ রেগে গেলাম। রেগে গিয়ে বললাম, ‘ঘটনা তাহলে এই? তাহলে তো আপনার সাথে যাওয়া যাবে না! আমাকে নামিয়ে দিন। কথায় কাজে যার মিল নেই এমন লোকের গাড়িতে আমি চড়ব না।’

মুশু ভাই আমার হঠাৎ রেগে যাওয়া দেখে বিস্মিত হয়ে গেলেন। কপাল কুঞ্চন করে বললেন, 'কী সব বলছ! কথায় কাজে মিল নেই মানে? আমি আবার কী করলাম?'

'একটু আগেই তো বললেন, স্বাধীন দেশে পোশাক পরার স্বাধীনতা থাকতে হবে। কে কী পোশাক পরবে এটা সে নিজেই ঠিক করে নেবে। এখন বলছেন পরিচালকের কথা মতো চলতে হবে! এটা কি দ্বিমুখিতা হয়ে গেল না?'

'আরে পাগল এটা তো নাটকে! বাস্তবে তো না।'

'পৃথিবীটাও একটা নাট্যমঞ্চের মতোই মুশু ভাই। এটা মোটেও আসল জগৎ না। মৃত্যুর পরের জগৎটাই আসল। একজন পরিচালক পুরো পৃথিবীটা পরিচালনা করছেন। তিনিই আমাদের সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা এবং নিরাপত্তাদাতা। কোনো মোল্লা-মৌলভিরা না; বরং সেই মহান পরিচালকই নারীর নিরাপত্তার জন্য একটা ড্রেসকোড নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, নারীরা এমন পোশাক পরবে না, যা থেকে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়ে যায়। সেই পরিচালক, পুরুষদেরকেও নির্দেশ দিয়েছেন চোখকে সংযত রাখতে। যেন তারা কোনো নারীর প্রতি কোনোরূপ অন্যায় দৃষ্টিপাত না করে।'

আমার উত্তর শুনে মুশু ভাই হাঁ করে তাকিয়ে আছেন। হয়তো তিনিও মনে মনে কোনো প্রত্যুত্তরে খুঁজছেন! আমি বললাম, 'ডোর লকটা খুলুন। আমাকে এখানেই নামতে হবে।'

'এখানে কোথায় যাবে?'

'কেন, মসজিদে! আপনিই তো বলেছেন, মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত। কথা তো একশ ভাগ সঠিক! কিন্তু, মসজিদের দৌড় কোথা পর্যন্ত জানেন তো? আল্লাহর আরশ পর্যন্ত। যেখানে এখনো কোনো বিজ্ঞানী-মহাবিজ্ঞানী পৌঁছতে পারেনি। কোনোদিন পারবে বলেও মনে করছি না। সুতরাং বুঝতেই তো পারছেন, দৌড়ের দিক থেকে মোল্লারা কতটা এগিয়ে আছে?'